দাম : বারো টাকা

মাস্ক অবশ্যই
ব্যবহার করুন
— পৃঃ ৯

স্বস্তিকা

সবরীমালা মন্দিরে নারীর
অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ কেন
— পৃঃ ১৭

৭৩ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ২৪ মে, ২০২১।। ৯ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিপর্যস্ত

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৪ মে - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

করোনা আছে আন্তরিকতা নেই

▯ মৌ চৌধুরী ▯ ৫

পশ্চিমবঙ্গে ল্যান্ড জেহাদ

▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৬

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত

▯ নারায়ণ চক্রবর্তী ▯ ৭

মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করুন

▯ ডা: উচ্ছল কুমার ভদ্র ▯ ৯

করোনা সংক্রমণ থেকে জীবন বাঁচাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই মহৌষধি ▯ ডা: দেবী শেঠী ▯ ১২

সরকারি নিয়মাবলী আত্মরক্ষার দাগিদেই মেনে চলতে হবে

▯ ডা: শুভঙ্কর গৌড়া ▯ ১৪

করোনা যুদ্ধের নির্ভীক সৈনিকরা আবার স্বমহিমায় আসরে অবতীর্ণ ▯ ১৫

করোনা মহামারীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবাকাজ

▯ ১৬

সবরীমালা মন্দিরে নারীর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ কেন

▯ নরেন্দ্রনাথ মাহাতো ▯ ১৭

সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের অবস্থান

▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ২০

চিঠিপত্র ▯ ২১

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

করোনার কারণে স্বস্তিকার কর্মীদের অসুস্থতা ও লকডাউনের জন্য স্বস্তিকার মুদ্রিত ও ডিজিটাল সংস্করণ পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত প্রকাশিত হবে না। স্বস্তিকার ১৭ই মে, ২০২১ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে এবং গ্রাহকদের কাছে সেই সংখ্যাটি পাঠানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর যে কয়েকটি সংখ্যা মুদ্রিত না হওয়ার কারণে গ্রাহকদের দেওয়া সম্ভব হবে না সেই সমসংখ্যক সংখ্যা তাদের গ্রাহক মেয়াদে বর্ধিত করা হবে। এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হওয়ার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এই পরিস্থিতিতে সকল গ্রাহক, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

সম্পাদক, স্বস্তিকা

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-700 071**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিম বাঙ্গলাদেশ গড়িবার ষড়যন্ত্র বানচাল করিতেই হইবে

পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস অব্যাহত। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২১ হাজারেরও বেশি মানুষ গৃহহীন এবং ৪০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনোভাবে আক্রান্ত। এই আক্রান্ত ও গৃহহীনদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। ১৪২ জন মহিলা নির্যাতনের শিকার হইয়াছেন। বহু মহিলার শ্লীলতাহানি হইয়াছে। ৫ হাজারেরও বেশি বাড়িঘর ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। বুলডোজার দিয়া গোসাবা এলাকায় তপশিলি উপজাতি মানুষদের ২০০টিরও বেশি বাড়িঘর ধ্বংস করা হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত এইসব ঘটনায় ২৬ জন প্রাণ হারাইয়াছেন, যাঁহাদের অধিকাংশই তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। এইসব বসতিগুলিতে ১৬২৭টি হামলার ঘটনা ঘটিয়াছে। কোথাও কোথাও গৃহহীনরা বাড়ি ফিরিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের শাসক দলে নাম লিখাইতে মুচলেখা দিতে বাধ্য করা হইতেছে। তাহারা নিজেদের ব্যবসা বা কাজকর্ম শুরু করিতে চাহিলে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা দিতে হইতেছে। বস্তুত এই সন্ত্রাস জেহাদি সন্ত্রাস।

বাঙ্গলায় এই ভয়াবহ হিংসা ভারত বিভাজনের হিংস্র নরসংহারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও কলকাতা পুলিশের উপস্থিতিতে রাজভবনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেখা গিয়াছে, তাহাতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া পুলিশ কমিশনারের কাছে জবাব তলব করিয়াছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশন, জাতীয় মহিলা কমিশন এবং জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থাগুলিও রাজ্যে সংঘটিত নৃশংসতা রোধ করিবার দাবি জানাইয়াছে।

এইসব অত্যাচারিত ও গৃহহীন হিন্দুদের বসবাসের ব্যবস্থা করা, তাহাদের লুণ্ঠিত বাড়িঘর তৈরি ও পুনর্বাসন, অনাথ শিশুদের ভরণ-পোষণ, আহতদের চিকিৎসা, হিন্দুদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে লড়াই, বন্ধ করে দেওয়া ব্যবসা শুরু, ভাঙা মন্দিরের পুনর্নির্মাণ ইত্যাদির মতো কাজগুলি অবিলম্বে শুরু হওয়া প্রয়োজন।

শুধু তাহাই নহে, এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের প্রতিরোধ শক্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাঙ্গলাদেশ গড়িয়া তুলিবার ষড়যন্ত্রকে নির্মূল করিতে হইবে। করোনা মহামারী হইতে বাঙ্গলাকে বাঁচাইবার পাশাপাশি পুরো দেশের হিন্দু সমাজও যে বাঙ্গলার পাশে আছে বলিয়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বার্তা দিয়াছে তাহা স্বাগত।

সুভাষিতম্

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে স্বর্গস্যোপরিতিষ্ঠতঃ।
প্রভুশ্চ ক্ষময়া যুক্তো দরিদ্রশ্চ প্রদানবান্।।

জগতে দুই প্রকারের লোক আছেন, যাঁরা স্বর্গের চেয়েও উচ্চস্থান লাভ করেন। এক, যিনি ক্ষমতাবান ও সম্পন্ন হয়েও দয়ালু হন এবং দুই, যিনি নির্ধন হয়েও দান করেন।

বিজ্ঞানীদের ধারণা কোনও মহমারীই চিরস্থায়ী নয়। ভাইরাস ঘটিত অসুখ মানব জীবনে আগেও এসেছে। অতিমারী, মহামারীর কাছে মানুষ অসহায় বোধ করেছে, কিন্তু রোগীকে অচ্ছুত করে রাখার এত প্রবণতা আগে খুব কম দেখা গিয়েছে।

করোনা আছে আন্তরিকতা নেই

মৌ চৌধুরী

করোনার বয়েস এক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। অন্নপ্রাশন, দুধের দাঁত গজানো, জন্মদিন সবই সুসম্পন্ন করে এগিয়ে চলেছে এই মহামারী। করোনা ভাইরাস, কোভিড-১৯ সকলের মুখে মুখে। গোটা পৃথিবীর ছবিটাই পালটে দিয়েছে এই মারণ অসুখ। কতটা প্রাণঘাতী এই ভাইরাস আজ একটা ছোট্ট শিশু পর্যন্ত জানে। মানুষের মনে ভয় ভীতি এবং করোনা হলে গোপন করার প্রবণতা চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে। উঠে গিয়েছে স্বজনের প্রতি ভালোবাসা আর সম্পর্কের আন্তরিকতা। সুস্থভাবে বাঁচার জন্য যে অসহায়তা মানুষকে সহ্য করতে হচ্ছে তাতে সংকীর্ণতা বাসা বাঁধছে। চেনা ছন্দ, চেনা সম্পর্ক কেমন অচেনা হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের জন্য মানুষ জীবনের ছন্দে ফিরতে চেয়েছিল। শুরু হয়েছিল সামাজিকতা আর সামাজিক অনুষ্ঠান। এসবের ফল যে কী ভয়ংকর হতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। একটা ঘটনা মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে তখনও করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এত প্রকট হয়নি। আমি পরিচিত একজনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়র বাড়িতে যাই। সেই বাড়িতে সদ্য একটি অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান হয়েছে। দেখেছি সারা ঘরময় না খোলা প্যাকেটে অনেক উপহার ছড়িয়ে আছে। এই দম্পতির কন্যা সন্তানের জন্মের দশ বছর পর পুত্র সন্তান কোলে এসেছিল। তাই বেশ ঘটা করেই অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান করেছিলেন পরিজনেরা। হাজারোজনকে আমন্ত্রণ জানানোও হয়েছিল। এর ফল যে কী ভয়াবহ হতে পারে তা কেউ ভাবতে পারেনি। অনুষ্ঠানের দু' সপ্তাহের ভেতর যার অন্নপ্রাশন হলো সেই শিশুটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবস্থা এতটাই গুরুতর হয়ে পড়ে যে শিশুটিকে নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করতে হয়। হাতে গোনা কয়েকদিনের ভেতর সেখানেই মৃত্যু হয় তার। চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুষ্ঠানের দিন এক বা একাধিক করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে শিশুটি এসেছিল। যে দম্পতি তাঁদের সন্তানকে হারিয়েছে তাঁদের ক্ষতি কোনও দিনও পূরণ হবে না। কিন্তু করোনা আক্রান্ত কিছু মানুষ রোগ গোপন করে বা না করে প্রকাশ্যে বেরিয়ে সমাজকে অন্ধকারের দিকে তো ঠেলে দিচ্ছে। তারা কোভিড-১৯-কে ছড়াতে সাহায্য করছে। এমন অনেকেই আছেন যারা করোনার উপসর্গ দেখা দিলে উপেক্ষা করে যান। অনেক সময় নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা শুরু করে দেন। কেউ যাতে বুঝতে না পারে সেই কারণে সকলের সঙ্গে মিশছেন। আর কোভিড পরীক্ষা তো অনেক দূরের কথা। গত বছরের তুলনায় এবারে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এইগুলি। এর আগে কেউ আক্রান্ত হলে গোটা পরিবার সচেতন হতো। সাধারণ ভাবে বাড়ির বাইরে আসতেন না। প্রশাসনও অনেক রকম কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রশাসন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি লকডাউন ঘোষণা করেছিল। দেখা গিয়েছে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হওয়ার পরে অনেকেই নিতে চাননি। এই কারণে অনেক ভ্যাকসিন নষ্ট হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। দ্বিতীয় ঢেউ আসাতে ভ্যাকসিনের চাহিদা বেড়েছে। তবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন দ্রুত সবাই ভ্যাকসিন পাবেন। তবে যাই হোক না কেন, এখনও করোনা আক্রান্ত রোগীর প্রতি অমানবিক মুখ দেখা যাচ্ছে। করোনা আক্রান্ত বয়স্ক মা-বাবাকে ফেলে সন্তানরা পালিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে অমানবিকতার উদাহরণ আর কী হতে পারে। এখনও কেউ করোনা আক্রান্ত হলে সামাজিক বয়কটের মুখে পড়তে হচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে সত্যি, আক্রান্তকে ফোনও করতে অনেকেই ভয় পাচ্ছে, যদি ফোনের মাধ্যমে জীবাণু এসে যায়। কথা হচ্ছে খাবার, জল, বাতাস বা স্পর্শের মাধ্যমে হাজারো ভাইরাস ঘটিত অসুখ মানব জীবনে এসেছে। অতিমারী, মহামারীর কাছে মানুষ অসহায় বোধ করেছে, কিন্তু রোগীকে অচ্ছুত করে রাখার এত প্রবণতা আগে খুব কম দেখা গিয়েছে। করোনার ভয়াবহতা নিয়ে অনেকেই এখনও যথেষ্ট সচেতন নয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সবাইকে আরও সচেতন ও রোগীর প্রতি আন্তরিক হতে হবে। রোগীর জন্য মানবিক হওয়ার পাশাপাশি সকলের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য অপরের যেন ক্ষতি না হয়। আপনজন ছাড়াও সকলের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করা দরকার। এই আবহে সহমর্মী হওয়া খুব জরুরি। সবাই জানেন এই মহামারী অনেক জীবন কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু তারপরেও সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই সময় 'মানুষ অমর নয়' মনে রেখেও 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এই প্রবাদ ভুলে যাওয়াই ভালো। হঠাৎ করে সকলের মানসিকতার পরিবর্তন হতে পারে না। তবে সবাই তো চাইতেই পারে পৃথিবীটা সুন্দর হোক ভালো থাকুক। দু'চোখে অন্ধকার নেমে আসার আগে হীরের দ্যুতি কল্পনা করে হৃদয়ে একটু আলো তো জ্বালানো যায়। জীবনের সব বাধা আন্তরিকতা দিয়ে সমাধান করা যেতেই পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা কোনও মহমারীই চিরস্থায়ী নয়। এই ভয়াবহ সময়ে ব্যক্তি মানব জীবনে করোনায় কে কবে আক্রান্ত হবে কেউ জানে না। তাই আপনজনের খেয়াল রাখা যাক আর আন্তরিক বন্ধনে সবাই এক হতে পারি।

ফঃ ৩

পশ্চিমবঙ্গে ল্যান্ড জেহাদ!

সুতপা বসাক ভড়

একটু থমকে যেতে হয়। অথচ, অস্বীকার করার বা চোখ ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। ল্যাণ্ড-জেহাদ কমপক্ষে দশ বছর আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গে হয়ে চলেছে। প্রত্যন্ত গ্রামের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো আমাদের জানতে দেওয়া হয় না অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে রাখা হয়। গুগলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সংবাদ আমাদের মুঠোর স্মার্ট ফোনের মধ্যে। অথচ ছোটো ছোটো গুরুত্বপূর্ণ ভয়াবহ ঘটনাবলীর সম্বন্ধে আমরা এত উদাসীন বা চোখ বুজে আছি, কেন?

ব্যাপারটা একটু দেখতে হবে। পূর্বভারতে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার কিছু অংশ ল্যান্ড জেহাদের কবলে পড়েছে এবং হিন্দুরা 'নিজভূমে পরবাসী'তে পর্যবসিত হচ্ছে। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গকে 'বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ' (Greater Islamic Bangladesh) বানানোর চক্রান্ত করা হয়েছে। যে জেলাগুলিতে ল্যান্ড জেহাদ রমরম করে চলছে, সেগুলি হলো--- বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো অজস্র মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে। প্রথমে একটু জায়গা দখল, তারপর অনেকটা জায়গা ঘিরে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, রেল-লাইনের ধারে, স্টেশনের পাশে, বাসরাস্তার ধারে, খেলার মাঠের একাংশ নিয়ে, পুকুর বুজিয়ে বা নদীর ধারে একটু একটু করে মুসলমানেরা (বেশিরভাগই অনুপ্রবেশকারী) জমি দখল করে নেয়— মুসলমান আধিপত্য বাড়ে। হিন্দুদের মেয়ে-বউরা ওইসব স্থান দিয়ে যাতায়াত করলে অপ্রীতিকর মন্তব্য করে বা ঘটনা ঘটনায়। ধীরে ধীরে তাঁরা ওই স্থান বর্জন করতে বাধ্য হয়। এই সুযোগেই জমিটি জোর করে মুসলমানরা দখল করে নিল। এটি হলো ল্যান্ড জেহাদ। পরিকল্পিতভাবে, মানচিত্র থেকে হিন্দুদের বাসস্থান মুছে ফেলে, সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের তপনদা, স্বর্গীয় তপন ঘোষের অভিজ্ঞতা অনুসারে বর্ধমানে মন্তেশ্বর ব্লক কুলজোড়া গ্রামে একটি ঘটনা ঘটে। গ্রামের একটি বিস্তৃত হিন্দুদের জমিতে দীর্ঘকাল ধরে গোরু চরানো হতো এবং একাংশে ছেলেরা খেলাধূলা করত— প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পরম্পরা চলে আসছিল। হঠাৎ করে একসময় মুসলমানরা দাবি করে বসে যে, ওই জমি তাদের। অথচ, মোট ৮.৪৮ একর জমি ৪টি হিন্দুর পরিবারের মিলিত সম্পত্তি। স্থানীয় বিএলআরও জানায় ওই জমি কিছুটা অধিকৃত— মুসলমানদের কবরখানা এবং বাকীটা হিন্দুদের। যেহেতু জমিটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা নেই, সেজন্য মুসলমানেরা ওই জমির পশ্চিমদিকটি দখল করে নিয়েছে, পুর্বদিকে শতাধিক বছরেরও আগে হিন্দুদের জমিতে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গাছ-পালা লাগানো হয়েছিল। বাকী জায়গায় ছেলেরা খেলাধূলা করে ও পশু পালন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এরপর ২৯ মে, ২০১৪ সালে কিছু মুসলমান যুবক এসে সিমেন্টের পিলার তুলতে শুরু করে ওই জমিতে। বক্তব্য— জমি তাদের, সেখানে ঈদের নামাজ পড়বে। স্থানীয় হিন্দুরা বাধা দেয়। অন্যদিকে মুসলমানেরা রাজনৈতিক সমর্থন পায়, যা হিন্দুরা পায় না। তপনদা ওই সময় হিন্দুদের পাশে এসে দাঁড়ান, তিনি ১৭ জুন, ২০১৪-তে হিন্দুদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বিএলআরও, মন্তেশ্বরকে জমা দেন। এই ভাবে শুরু হয় প্রতিরোধ।

বেশ কয়েকবছর আগে অশোকনগরের জমিটি মাপছেন, তখন দেখেন ওই জমির একাংশ দখল করে আছে একটি মুসলমান পরিবার। তারা এসে গণ্ডগোল শুরু করলে সরকারি কর্মচারীটি পালিয়ে যায়। মাস্টারমশাইকে আক্রমণ করলে তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ছুটে আসে। তাদেরও মারধোর করা হয়। জমিটি টাকা দিয়ে কেনা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ মালিকানা পেলেন না মাস্টারমশাই। প্রশাসন কোনোরকম সহায়তা করেনি। ফলস্বরূপ, হিন্দু জমি হয়ে গেল মুসলমানের। জমির পরিচিতি বা মানচিত্র এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এইরকম একটি দুটি নয়, অজস্র ঘটনা ঘটে চলেছে এ রাজ্যে, সেখানে পরিকল্পিতভাবে ভোট পাওয়ার জন্য হিন্দুর জমি কেড়ে মুসলমানদের জমি পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে।

হুগলী জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে জমির মূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই ছিল। সত্যি বলতে কি, পারিবারিক কৃষিভূমি খুব অসুবিধা না হলে কেউ বিক্রি করতে চায় না, সম্প্রতি হঠাৎ করে সেখানকার জমির দাম আকাশ-ছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। এমনটি স্থানীয় মানুষজন আগে দেখেননি। খবর নিয়ে জানা গেল, মুসলমানরা ক্রেতা সেজে চড়া দামে হিন্দুর জমি কিনে নিয়ে মুসলমান বসতি শুরু করছে। তাদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতির ক্রুরতা শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তখন অন্যরাজ্য যেমন (জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশের মতো) হিন্দুরা নিজেদের ভিটে-মাটি ছেড়ে বিস্তারিত হতে বাধ্য হবে। মানচিত্রে হিন্দু জনবহুল স্থানটি মুসলমান জনবসতিরূপে পরিগণিত হবে। এইসব খবর লেখক, সাংবাদিকরা লেখেন না। রাজ্যসরকার ভোটের লোভে মুসলমানদের সমর্থন করে চলেছে। এক শ্রেণীর মানুষ উটপাখির মতো বালিতে মাথা গুঁজে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ (একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য) তথা সম্পূর্ণ ভারতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে, যদি আমরা এখনও সতর্ক না হই।

নিজস্ব স্থানকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজেদের। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের এই দায়িত্ব নিতে হবে। মহিলারা খুব স্বাভাবিকভাবে সহজাত ক্ষমতা দিয়ে সামাজিক মেলামেশা করে থাকেন। অনেক সদুদ্দেশ্যে ওঁরা মানসিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন তাঁদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। নিজস্ব নিরাপত্তা বজায় রেখে নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি না করা, নিতান্ত অসুবিধা হলে একজন হিন্দুর কাছে হস্তান্তরিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এতে ওই স্থানের অস্তিত্ব বজায় থাকে। পূর্বজরা বলে গেছেন, 'জননী জন্মভূ মিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'। বিশেষত, আমরা মহিলারা এই সদুদ্দেশ্যে অগ্রণী হলে ল্যান্ড-জেহাদকে অবশ্যই প্রতিহত করতে পারব। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া একটুকরো পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার। □

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত

নারায়ণ চক্রবর্তী

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সারা দেশের সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও আছড়ে পড়েছে। তার প্রভাবে এই মুহূর্তে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে পড়েছে। কারণগুলি খতিয়ে দেখে প্রতিকারের বিধান দেওয়ার চেষ্টায় এই প্রতিবেদন।

২০২০ সালের প্রথম করোনার ঢেউয়ের সময় থেকে এখনকার দ্বিতীয় ঢেউয়ের কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমত, এই দ্বিতীয় ঢেউ অনেক অল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষকে সংক্রমিত করেছে, অর্থাৎ এর সংক্রমণ ক্ষমতা প্রথম ঢেউয়ের তুলনায় অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, এই ভাইরাসটি অতি দ্রুত ফুসফুস ও কিডনীকে নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। এর চিকিৎসায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ হলো রেমডিসিভির। পাঁচদিনের কোর্সে ওষুধটি IV পুশ করতে হয়। প্রথম দিকে প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এর জোগান রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে খুব কম ছিল। সেজন্য করোনা রোগীর চিকিৎসায় দ্বিতীয় ঢেউয়ের শুরুতেই আমাদের রাজ্য পিছিয়ে পড়ে। এর দায় রাজ্য প্রশাসনের, সঠিকভাবে স্বাস্থ্যদপ্তর, বিশেষত স্বাস্থ্যভবনের। এরপর আসি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায়। এই রাজ্যে রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা অনেক সময়ই অত্যন্ত মারমুখী এবং তারা যখন ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর চড়াও হয়ে মারধোর করে সেসব এত বছরেও রাজ্য সরকার এবং তার পুলিশ বন্ধ করতে ব্যর্থ। ফলে, হাসপাতালের চিকিৎসায় ওয়ার্ক-টু-রুল-এর উপরে যে মানবিক দিক থাকে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। তবুও বলতে দ্বিধা নেই, ডাক্তার, সিস্টার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মূল সমস্যাগুলি সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় আজ যখন স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর করোনা রোগীর অতিরিক্ত চাপ এসে পড়েছে, তখন তারা দিশেহারা হয়ে গেছে। এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ

করোনা রোগীর চাপে এমনিতেই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রবল চাপের মধ্যে। এখন যদি ডেঙ্গু, ফ্লু ইত্যাদির বাড়বাড়ন্ত হয় তবে এইসব রোগীরা চিকিৎসা পাবেন কী করে সেটা যেন প্রশাসন মাথায় রাখে।

অক্সিজেনের ঘাটতি। তাহলে আমাদের রাজ্য-সহ কোনো রাজ্যেই অক্সিজেনের ঘাটতি থাকার কথা নয়। সারা দেশে অক্সিজেন উৎপাদন ক্ষমতা দিন প্রতি সর্বোচ্চ ৭৫০০ মেট্রিক টন। এর মধ্যে করোনা পরিস্থিতির মেডিকেল অক্সিজেনের গড় চাহিদা দিনপ্রতি ৫৫০০ মেট্রিক টন।

সুতরাং বাণিজ্যিক কাজে অক্সিজেনের ব্যবহার সাময়িক বন্ধ করে অক্সিজেনের যথাযথ বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখলে অক্সিজেনের অভাব হওয়ার কথা নয়। আসলে সমস্যা অন্য জায়গায়। সেটা হলো অক্সিজেন বহনকারী সিলিন্ডারের ঘাটতি। সাধারণত দরকারের থেকে ১৫-২০ শতাংশ অবধি বেশি সিলিন্ডার মজুত রাখা হয়। সেজন্য চাহিদা হঠাৎ বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় এই ঘাটতি। সুযোগ বুঝে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী অক্সিজেন সিলিন্ডারের কালোবাজারী শুরু করেছে, কেউ বাণিজ্যিক কাজে (ওয়েল্ডিং সহ) এই অক্সিজেন ব্যবহার করছে। এরজন্য এই অক্সিজেনের ঘাটতি। এগুলো রাজ্য সরকারের দেখার কথা। তারা এই কাজে এখনো অবধি ব্যর্থ। আবার একই সাপ্লাইয়ের অক্সিজেন ফ্লো-রেগুলেটারের সাহায্যে কয়েকজন রোগীকে দেওয়া যায়। অবশ্য এই ব্যবস্থা সাময়িক আর এতে অক্সিজেনের ব্যবহার কম হয় না। কিন্তু সাময়িক অক্সিজেন ঘাটতির সময় রোগীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা জরুরি। খবরে দেখলাম, ফ্লো-রেগুলেটার খারাপ থাকায় এক সরকারি হাসপাতালে দুজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। অবশ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অন্য কথা বলেছেন। আমরা প্রতিদিন সংবাদমাধ্যম মারফত জানতে পারছি দিল্লি, অন্ধ্র প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানায় অক্সিজেনের অভাবে কত মানুষ মারা যাচ্ছেন। করোনার প্রথম আক্রমণের সময় যেমন রাজ্যে প্রশাসন মৃত ও আক্রান্তের হিসেবের গোলমালে জড়িয়ে গিয়েছিল, এবারেও আবার দেখছি অক্সিজেনের অভাবে নাকি মানুষ এই রাজ্যে মারা যাননি। অথচ রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন। এই অতিমারীর মোকাবিলায় আমাদের রসদ পর্যাপ্ত নয়— সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু

আন্তরিক চেষ্টা ও সতত না থাকলে তা অপরাধ।

আমাদের স্বাস্থ্যদপ্তর শুধু যে অক্সিজেনের কালোবাজারী রুখতে ব্যস্ত তাই নয়, ওষুধের কালোবাজারীও দেদার চলছে। হার্টের সমস্যায় কিছু রোগীকে atrial fibrillation আটকনোর জন্য একটি ওষুধ rivaroxaban। এটির ১৪ ট্যাবলেটের পাতার এমআরপিতে দাম ১২০ টাকা। ওষুধটি অনেক জায়গায় করোনা রোগীদের দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাজারে এই ওষুধটি আর পাওয়া যাচ্ছে না। বহুগুণ বেশি দাম দিলে পরিচিত দোকানে মিলছে!

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা জানাচ্ছি— যদিও এমন ঘটনা আমাদের রাজ্যে আকছার ঘটছে। সোদপুরের সুভায়নী হাসপাতালে একজন করোনার রোগী মারা গেলেন। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ওই রোগীর জন্য হাসপাতালে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা জমা দিয়েছিলেন। তারপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পুরো বিলের তিন লক্ষ আঠারো হাজার টাকা না দিলে মৃতদেহ ছাড়া হবে না! এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত (ত্রিশ ঘণ্টা) মৃতদেহ আটকে রাখা হয়েছে। প্রশাসন কি করছে? সরকার এ ব্যাপারে শুধু 'অ্যাডভাইসারি' জারি করছে! অ্যাডভাইসারি প্রাইভেট স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি শুনলেও মানতে আইনত বাধ্য নয়। সরকার 'বিজ্ঞপ্তি' জারি করলে তারা সেটা মানতে বাধ্য। এই দ্বিচারিতা কিন্তু গোপন আঁতাতের সন্দেহ তৈরি করে।

যখন সাধারণ মানুষজন সবাই জানেন যে প্রথম ঢেউয়ের পর করোনার মতো আরএনএ ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ আসা সময়ের অপেক্ষা মাত্র, তখন সরকারের তথাকথিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সরকারকে কি পরামর্শ দিয়েছিল? আমরা দেখলাম, প্রথম ঢেউয়ের প্রকোপ কমতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে করোনা রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট বেড এবং সর্বোপরি পরিকাঠামো বন্ধ করে দেওয়া হতে লাগল। অথচ এই সময় দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য তৈরি হলে— পরিকাঠামোর আরও উন্নতি করলে, এই বিপর্যয় অনেকটাই এড়ানো যেত। এর সঙ্গে উৎসবের মরসুমে সংযম দেখানো মানুষদের কাছে বিনোদনের সকল উপকরণ, সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট, শপিং মল, ক্লাব, সুইমিংপুল, চিড়িয়াখানা এমনকী পর্যটন ও হোটেলগুলিও দেশের অর্থনীতির দোহাই দিয়ে খুলে দেওয়া হলো! এগুলে রাজ্য সরকার অত্যন্ত ভুল কাজ করেছে যার খেসারত এখন জনসাধারণকে দিতে হচ্ছে। একজন পরামর্শদাতাও কিন্তু পরিকাঠামো আরও মজবুত করার কথা বললেন না। এরপর ট্রেন, মেট্রো, বাস, অটো-সমেত সমস্ত গণপরিবহণের উপর থেকে সব রকমের বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হলো! হ্যাঁ, ইতিমধ্যে সাধারণ নির্বাচনে রাজনীতির মিটিং, মিছিল, জমায়েত দ্বিতীয় ঢেউয়ের দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করল। এখন রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা বিশ হাজারের উপর। দৈনিক মৃত্যু তিনশো থেকে সাড়ে তিনশোর মধ্যে। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে করোনা পরীক্ষার হার অন্য রাজ্যের তুলনায় কম। এমনকী করোনা রোগীর মৃত্যুর পরেও শান্তি নেই। সরকার সৎকারের নিয়ম আর মূল্য বেঁধে দিয়েছে! কিন্তু এখানে এসব খাতায় লেখা থাকে। মানুষের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত খারাপ। এক ভদ্রমহিলা টিভিতে জানিয়ে ছিলেন তাঁর আত্মীয়ের সৎকার করার জন্য তাঁকে কীভাবে খেপে খেপে ত্রিশ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স থেকে, শববাহী গাড়ি থেকে, ডোম অবধি, সব জায়গায় মানুষ তোলাবাজির শিকার। মর্গ থেকে দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য দশ থেকে পঁচিশ হাজার, যে কোনো রকম টাকা চাওয়া হচ্ছে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য দায়ী করোনা ভাইরাসের পরিবর্তিত জিন মিউটেশন— এটি সব আরএনএ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য, যার ফলে ভাইরাসের চরিত্রগত কিছু পরিবর্তন হতে পারে। এখন যে কথাটা প্রায়শই শোনা যায়— ডাবল মিউট্যান্ট, ট্রিপল মিউট্যান্ট ভ্যারিয়েন্ট ইত্যাদি। আমাদের দেশে এখনো অবধি নয় রকমের মিউটেট করা করোনা ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। ভাইরাসের ধর্ম বোঝা যায় তার জিনোম সিকোয়েন্সিং অনুধাবন করলে। এই জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে একবার পরিবর্তন হলে তা সিঙ্গল মিউট্যান্ট, দুবার হলে ডাবল মিউট্যান্ট, তিনবার হলে ট্রিপল মিউট্যান্ট ইত্যাদি। এইভাবে পরিবারের যে আলাদা রকমের ভাইরাস তৈরি হয়, তাদের ভ্যারিয়েন্ট বলে। আর এই ভ্যারিয়েন্টগুলি যখন তদের ধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়ে সংক্রমণ ক্ষমতা, মিউটেশান ক্ষমতা, সনাক্তকরণ ক্ষমতা (যার উপর ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা নির্ভর করে) ইত্যাদির পরিবর্তন করে তখন তাদের বলে আলাদা স্ট্রেইন। আমাদের দেশে দ্বিতীয় ঢেউয়ের সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ পাওয়া গেছে দুটি স্ট্রেইনের— ব্রিটেন স্ট্রেইন (B.1.1.7), এছাড়া E48Q এবং L424R। এই দুটি ভ্যারিয়েন্টের সংমিশ্রণে উৎপন্ন ডাবল মিউট্যান্ট স্ট্রেইন— এটির সংক্রমণ ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় কয়েকশো গুণ বেশি। এছাড়া সাউথ আফ্রিকা স্ট্রেইন, ব্রাজিল স্ট্রেইন, অস্ট্রেলিয়া স্ট্রেইন, ক্যালিফোর্ণিয়া স্ট্রেইন ইত্যাদিও পাওয়া গেছে। আমাদের রাজ্যে এখনো অবধি এটি ট্রিপল মিউট্যান্ট ভ্যারিয়েন্ট স্ট্রেইন পাওয়া গেছে (B.1.618)। এর দ্রুত সংক্রমণ করার ক্ষমতা এবং replication ক্ষমতার জন্য একটি মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। যত বেশি ভ্যারিয়েন্টের স্ট্রেইন পাওয়া যাচ্ছে, তত আমাদের বায়োটেকনোলজির জ্ঞানে বোঝা যাচ্ছে, এই স্ট্রেইনগুলির ভ্যাকসিনকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতাও ততই বাড়ছে। নতুন নতুন স্ট্রেইনের জন্য নতুন নতুন ভ্যাকসিনের আবশ্যকতা অবশ্যই আছে।

এবার আসি এই রাজ্যের ভ্যাকসিনেশানের কথায়। এখনো অবধি প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ মিলিয়ে দেশে সতেরো লক্ষের মতো মানুষের টীকাকরণ হয়েছে। যদি দুটি ডোজের সম্পূর্ণ টীকাকরণের হিসাব ধরা হয়, তবে ১ শতাংশ মানুষের টীকাকরণ শেষ হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে এখনো পর্যন্ত এক কোটি কুড়ি লক্ষের মতো টীকা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ টীকাকরণের হার ০.৫ শতাংশ মাত্র। কিন্তু এই রাজ্যে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো অনুপ্রাণিত আদেশনামা। এই পরিস্থিতিতে যখন প্রায় সব কিছু লকডাউনের পর্যায়ে চলে গেছে তখন, ১ মে পরবর্তী টীকাকরণের ক্ষেত্রে সরকারি আদেশ হলো, সব বেসরকারী টীকাকেন্দ্রে টীকা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে শুধু সরকারি হাসপাতাল, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পৌরসভা দ্বারা টীকাকরণ করতে হবে। এমনকী যারা প্রথম ডোজ বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েছেন, তাদেরও এই সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আবার ১৮+ বয়েসের মানুষদের টীকাকরণ শুরু হয়েছে। সুতরাং টীকাকরণের সংখ্যা অনেক বাড়বে। এদিকে টীকাকরণকেন্দ্রের সংখ্যা কমবে। আমরা যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে একই লাইনে দাঁড়িয়ে গুঁতোগুঁতি করে টীকা নেব! হয়তো যারা টীকা নেবেন তাদের অনেকেই করোনা সংক্রমণ ফ্রি পাবেন। অথচ যে মানুষজন অল্প কিছু কনভেনিয়েন্স ফি দিয়ে আগের মতো বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টীকা নিচ্ছিলেন, সেই ব্যবস্থাটা চালু রাখলে সরকারের কী অসুবিধা ছিল তা আমাদের অজানা।

পরিশেষে বলি, করোনা রোগীর চাপে এমনিতেই হাসপাতালের পরিকাঠামো চাপের মধ্যে। এখন যদি ডেঙ্গু, ফ্লু ইত্যাদির বাড়বাড়ন্ত হয় (বর্ষাকাল আসছে), তবে অন্য রোগীরা আমাদের রাজ্যে চিকিৎসা পাবে কী করে সেটা যেন প্রশাসন মাথায় রাখে। □

মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করুন

ডাঃ উচ্ছল কুমার ভদ্র

ডিসেম্বরে ২০১৯-এ চীনের উহান প্রদেশের মাংসের বাজারে নতুন করোনাভাইরাসের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে যে দুটো তত্ত্ব ছিল, তার প্রথমটি হলো : এটি প্রাণীদেহে অন্যান্য ভাইরাসের সঙ্গে জিনগত সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত নতুন প্রজাতির এক ভাইরাস, যা মানুষের দেহেও বংশবিস্তার করতে পারে (এমন ঘটনা প্রাণীদেহে হামেশাই ঘটছে, কিন্তু উৎপন্ন বহু প্রজাতির মধ্যে হাতে গোনা যে কটি ভাইরাস প্রাণী ও মানবদেহে দু' জায়গাতেই বংশবিস্তার করতে পারে, তারাই অসুখের উৎপত্তি করে)।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি হলো : এই ভাইরাস চীন তার উহান প্রদেশে অবস্থিত জৈবাস্ত্র গবেষণাগারে জিনগত গবেষণায় তৈরি করেছে এবং কোনও কারণে এটি বাইরে বেরিয়ে পড়ে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। রোগটি চীন ছাড়িয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ায় গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে প্যানডেমিক বা বিশ্ব-মহামারী ঘোষণা করে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ অসুখ সম্পর্কে আলোচিত বহু প্রশ্নের একটি হচ্ছে : ব্যক্তিগত

স্তরে এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে যা যা করণীয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে 'মাস্ক' বা মুখোশের ব্যবহার। এই 'মাস্ক' কীভাবে কাজ করে? কারা পরবে, আর কাকে কতটা সুরক্ষা দেবে?

করোনাভাইরাসের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এখনও সবকিছু জানা না গেলেও যতটুকু জানা গেছে, তা হচ্ছে এটা হাঁচি-কাশির সঙ্গে নির্গত জলকণার মধ্যে থাকে। সেই জলকণা ছড়ানো বন্ধ করতে পারে মাস্ক। ওই জলকণা অন্য কেউ সরাসরি নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিলে বা তার চোখে-মুখে পড়লে কিংবা তা পারিপার্শ্বিক জিনিসপত্রে পড়ার পর সেখানে হাত লাগালে সেই হাত চোখে বা মুখে লেগে দেহে সংক্রমণ আসতে পারে। ওই জলকণা বাতাসে শুকিয়ে গেলে সেই খোলা ভাইরাস কতটা দূরে গিয়ে সংক্রমণ ঘটাতে পারে তা এখনও জানা যায়নি।

মাস্কে একটা ফিল্টার বা ছাঁকনি থাকে, যা রোগ-জীবাণু সংবলিত হাঁচি-কাশির জলকণা আটকে দেয়। ওই ছাঁকনি তৈরি হয় বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো এক ধরনের প্লাস্টিক শিট থেকে। বলা হচ্ছে ছাঁকনি— যদিও কেটলির চা যে পদ্ধতিতে ছাঁকা হয় মাস্কের ছাঁকার পদ্ধতি তার থেকে আলাদা। 'ছাঁকনি'র ফেব্রিকের স্তরে যে ছিদ্রগুলো রয়েছে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংবলিত জলকণা তার থেকে আকারে বড়ো

হলেও ওই ছিদ্রে আটকে যায়। কারণ ওই ছাঁকনিতে একটা স্থির-বিদ্যুতের চার্জ দেওয়া থাকে এবং সেই চার্জ জীবাণুদেহের বিপরীত চার্জের জন্য তাকে ছাঁকনির গায়ে আটকে ফেলে। কতটা আটকায়, তা দিয়ে ওই মাস্কের কার্যকারিতার হিসেব হয়। মাস্কের কার্যকারিতার আর একটা নিয়ামকও রয়েছে; তা হলো মাস্ক এবং ব্যক্তির মুখের চামড়ার মধ্যে ফাঁক। ওই ফাঁক সাধারণত থাকে নাকের দু'পাশে এবং কম-বেশি অন্যত্রও। ওই ফাঁক দিয়ে সংক্রমণ হতেই পারে; তাতে মাস্কের কার্যকারিতাও কমে যায়। কিন্তু নির্মাণের কৌশলে মাস্ক রোগ প্রতিরোধে প্রায় ১০০ শতাংশ কার্যকরী হতে পারে।

বাজারে মোটামুটিভাবে তিন রকমের মাস্ক পাওয়া যায় : সার্জিক্যাল মাস্ক, এন-৯৫ বা ওই জাতীয় মাস্ক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক মাস্ক। সার্জিক্যাল মাস্ক (ভেতর দিকে সাদা, আর বাইরের দিকে নীল বা সবুজ)-এর তিনটে স্তর; মাঝের স্তরে থাকে ওই বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো 'ছাঁকনি'। সার্জিক্যাল মাস্কের ব্যবহার হয় ব্যবহারকারীর শরীর থেকে হাঁচি-কাশির জলকণা ও রোগজীবাণু যাতে বাইরে না ছড়ায় তা নিশ্চিত করতে। শল্যচিকিৎসক যখন অপারেশন করেন, তিনি এবং তাঁর সঙ্গের অন্যান্যরা রুগির সুরক্ষার জন্যই মাস্ক পরেন।

সার্জিক্যাল মাস্ক ছাড়াও দ্বিতীয় যেসব মাস্ক রয়েছে তা হচ্ছে : এন-৯৫, এন-৯৭, এন-৯৯, এন-১০০ ইত্যাদি; এই মাস্কগুলোর নামে যে সংখ্যাটা রয়েছে, তাতে বাতাসে অবস্থিত বিভিন্ন কণার কত শতাংশ ওই মাস্কটি ফিল্টার করে বা ছেঁকে আটকে দেবে তা বোঝায়। এগুলো ভাইরাস আটকাতে সক্ষম। এগুলোকে আসলে মাস্ক না বলে 'রেসপিরেটর' বলা হয়। মাস্ক আর রেসপিরেটরের মূল পার্থক্য হচ্ছে মাস্ক যিনি পরবেন তাঁর হাঁচি-কাশির সংক্রমণ বাইরে ছড়াবে না; আর রেসপিরেটর যিনি পরবেন তিনি বাতাসে ঘুরে বেড়ানো ভাইরাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিয়ে নিজে সংক্রামিত হবেন না। বলাই বাহুল্য, ওই রেসপিরেটরগুলোর কোনোটাই খুব সহজলভ্য নয়, সবগুলোই দামি, ব্যবহারকারীর মুখে এগুলো খুব আঁটোসাটো হয়ে সেঁটে বসার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রত্যেকের মুখের গড়ন আলাদা হয় বলে একটি মাস্ক একজনই ব্যবহার করতে পারেন। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা ওগুলো শুধুমাত্র ডাক্তার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর জন্যই সুপারিশ করেছেন, যাঁরা এই ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে তাঁর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করছেন। ওগুলো সাধারণ মানুষের জন্য নয়।

তৃতীয় ধরনের অর্থাৎ বাজারের অন্যান্য বাণিজ্যিক মাস্কগুলো এই সময়ে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে এবং মানুষ সেগুলো হই হই করে কিনে চলেছেন। সেগুলো কতটা সুচারু পদ্ধতিতে তৈরি? প্রশ্নটি অত্যন্ত বড়ো প্রশ্ন এবং ব্যবসায়ীরা এই বর্তমান পরিস্থিতির ফায়দা তুলবেন কিনা, সেটা মাথায় রেখেই। বাজারে অনেক রকমের ফেব্রিক (কাপড় ও প্লাস্টিক)

করোনা ভাইরাস নিয়ে দশটি রটনা

সোশ্যাল মিডিয়ায় আজকাল অনেকেই করোনা ভাইরাস নিয়ে নানারকম পোস্ট করছেন। বলা বাহুল্য, এইসব পোস্ট জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন না কোনটা বিশ্বাস করবেন আর কোনটা করবেন না। স্বস্তিকা এরকম দশটি রটনাকে বেছে নিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্যের সঙ্গে যাচাই করে প্রকৃত সত্য এখানে দেওয়া হলো।

রটনা ১ : খুব ঠাণ্ডায় করোনা ভাইরাস বাঁচে না।

উত্তর : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে এরকম কোনও তথ্য নেই। ভাইরাস থেকে বাঁচার সব থেকে কার্যকরী উপায় সাবন দিয়ে ঘনঘন হাত ধোওয়া।

রটনা ২ : গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় করোনা ভাইরাস বাঁচে না।

উত্তর : এই রটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে। অনেকেরই ধারণা

ভারতে গরম আর একটু বাড়লেই ভাইরাস পালাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, এ ব্যাপারে এখনই নিশ্চিত করে বলার মতো সুনির্দিষ্ট তথ্য তাদের কাছে নেই।

রটনা ৩ : ফুটন্ত গরম জলে স্নান করলে সংক্রমণ হয় না।

উত্তর : ভুল। এরকম কখনও হয় না।

রটনা ৪ : করোনার ওষুধ বেরিয়ে গেছে।

উত্তর : গবেষণা চলছে। ওষুধ এখনও বেরোয়নি।

রটনা ৫ : করোনা ভাইরাস মশার মাধ্যমে ছড়ায়।

উত্তর : এরকম কোনও তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে নেই।

রটনা ৬ : ড্রায়ার দিয়ে হাত শুকিয়ে নিলে সংক্রমণ হয় না।

উত্তর : ড্রায়ার থেকে নির্গত তাপের সাহায্যে ভাইরাসকে মেরে ফেলা যায়— এ ধারণা ভুল।

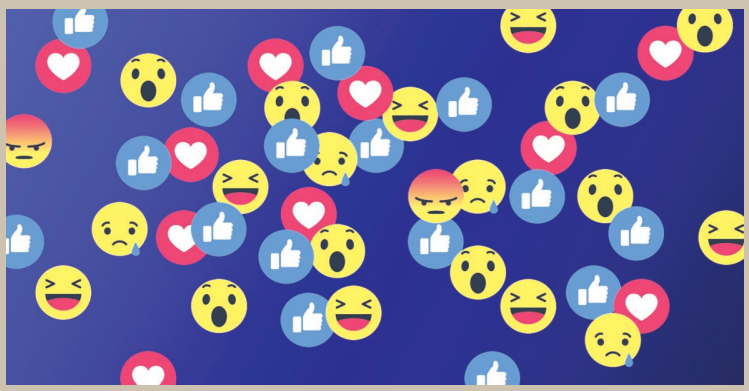

করোনা সংক্রমণ সেরে যায়।

উত্তর : ব্যাকটেরিয়াজনিত অসুখে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে কাজ হয়। ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না।

রটনা ৮ : করোনা সংক্রমণের ভয় বৃদ্ধদের বেশি। যুবকেরা নিরাপদ।

উত্তর : যে কোনও বয়েসের মানুষ করোনা ভাইরাসের কবলে পড়তে পারেন। তবে যাদের হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস এবং ফুসফুসের অসুখ আছে তাদের ঝুঁকি বেশি।

রটনা ৯ : কাঁচা হলুদ খেলে করোনা সংক্রমণ হয় না।

উত্তর : এ ব্যাপারে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

রটনা ১০ : থার্মাল স্ক্যানার সংক্রমণ হয়েছে কিনা বলে দিতে পারে।

উত্তর : থার্মাল স্ক্যানার (উদাহরণ : থার্মোমিটার) শুধুমাত্র শরীরের তাপমাত্রা মাপতে পারে। কী ধরনের সংক্রমণের কারণে তাপমাত্রা, তা বলতে পারে না।

(তথ্য : ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন)

পাওয়া যায়; বেশিরভগই (যেমন রুমাল) ভাঁজ করে নাকে চাপা দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস করা চলে (অর্থাৎ ওই ফেব্রিকে ছিদ্র যথেষ্ট বড়ো)। আবার এমন ফেব্রিকও বিশেষভাবে তৈরি করা যায় যার ভেতর দিয়ে ওই রকমভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আদান-প্রদান দৃশ্যতই করা যায় না। সাধারণ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যে বাণিজ্যিক মাস্কগুলো বিক্রি হয় সেগুলোতে ঠিক কী ধরনের ফেব্রিক ব্যবহার করা হয়েছে সেই ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায় এবং কাজে কাজেই, তাদের কার্যকারিতাও প্রশ্নাতীত নয়। এগুলোর কার্যকারিতা কমবার আর একটা কারণ মাস্ক এবং মুখের চামড়ার মধ্যে ফাঁকও।

মাস্ক কারা ব্যবহার করবেন? আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা একমত যে, মাস্ক তাঁদেরই ব্যবহার করা উচিত, যাঁদের সর্দি-কাশি হয়েছে, অর্থাৎ যাঁরা হাঁচছেন বা কাশছেন। মাস্ক পরলে তাঁদের হাঁচি-কাশির সঙ্গে নির্গত জলকণা-পরিবৃত জীবাণু বাতাসে ছড়াবে অনেকটাই কম, অর্থাৎ সংক্রমণ ছড়াবে কম। তবে কি যাঁরা অসুস্থ নন, অর্থাৎ যাঁদের হাঁচি-কাশি নেই, তাঁরা মাস্ক পরবেন না? আসলে মাস্ক পরলে তাঁদের মনে একটা 'আমি সুরক্ষিত' ভাব আসতে পারে, যা সঠিক নয়, কেননা অন্যের হাঁচি-কাশি তাঁদের জামাকাপড়ে পড়ে সেগুলো থেকে তাঁর হাতে এবং হাত থেকে চোখে সংক্রমণ পৌঁছে দিতে পারে। এই মুহূর্তে সবাই দৌড়াদৌড়ি করে মাস্ক কিনছেন, ফলে বাজারে মাস্কের আকাল দেখা দিয়েছে বা অচিরেই দেবে। মাস্ক পরার দরকার হলে এবং পাওয়া না গেলে বাড়িতে কাগজ বা রুমাল একাধিক স্তরে ভাঁজ করে মাস্ক বানিয়ে নিন। আর রেসপিরেটরের সম্পর্কে তো আগেই বলা হয়েছে, ওগুলো ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মী বা আক্রান্ত রুগির পরিচর্যাকারীর জন্য।

সুস্থ মানুষ মাস্ক না পরলেও তাঁরা সবার থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন, বিশেষত যাঁর হাঁচছেন বা কাশছেন তাঁদের থেকে। এই দূরত্ব কতটা? গবেষণায় দেখা গেছে যে, হাঁচি বা কাশির ফলে নির্গত জলকণা সর্বাধিক ছয় মিটার (১৮ ফিট!) অবধি ছড়াতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দু'এক মিটারের বেশি যায় না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলেছেন। বলাই বাহুল্য, যত বেশি দূরত্ব বজায় রাখা যায়, সুরক্ষা ততই বেশি। আর এছাড়া ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং বিশেষত ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান মেখে হাত ধোওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। যেহেতু এই করোনা ভাইরাস হাঁচি-কাশির সঙ্গে নির্গত জলকণার ভেতরে থাকে, ওই জলকণা যেখানে পড়বে, সেখানে আপনার হাত লাগলে আপনার হাতে এসে যাবে ওই ভাইরাস, আর তারপর আপনি নিজেকে সংক্রামিত বা আশেপাশের অন্যান্য নির্জীব বস্তুকে সংক্রামক করে ফেলতে পারেন। সেই কারণেই বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান মেখে হাত ধুতে বলা হচ্ছে। জল ব্যবহার করার অবস্থা না থাকলে হাতে অ্যালকোহল-যুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতেও বলা হচ্ছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সত্যিই কোনও বিকল্প নেই। স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প সেই কারণেই দেশের সর্বকলের সবচেয়ে জরুরি প্রকল্পগুলোর একটি।

(লেখক বেলেঘাটার সংক্রামক ব্যাধি চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হন)

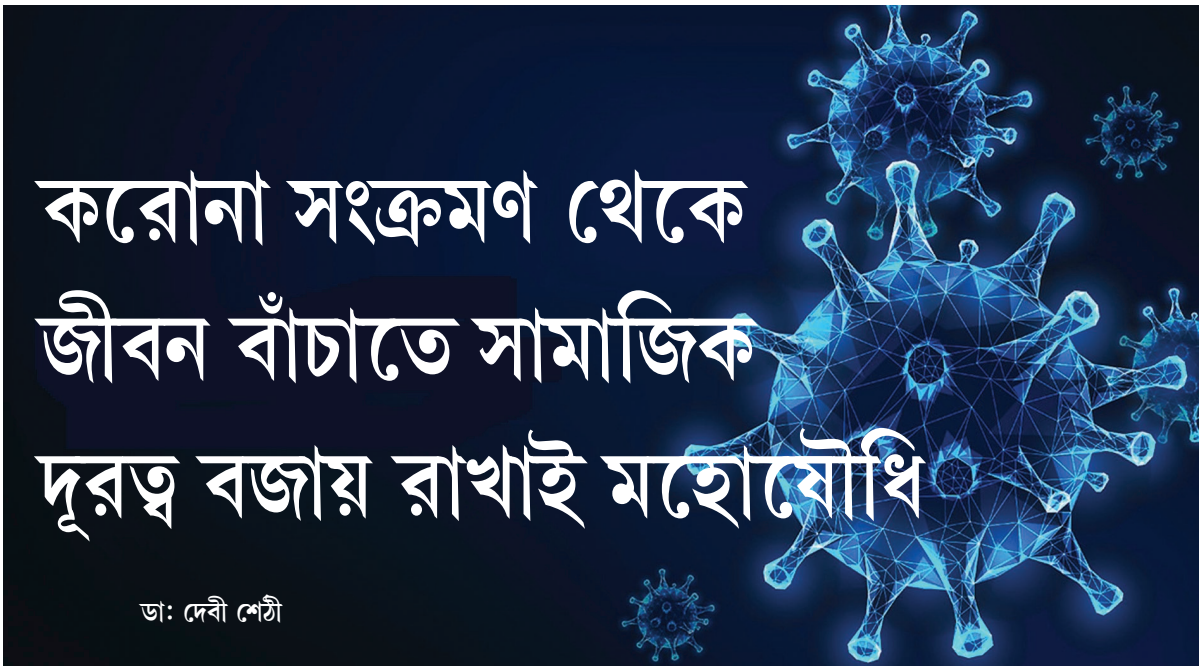

করোনা সংক্রমণ থেকে জীবন বাঁচাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই মহৌষধি

ডা: দেবী শেঠী

ফেব্রুয়ারি মাসের (২০২০) শেষ সপ্তাহে আমেরিকার বাইয়োজেন নামে একটি জৈব প্রযুক্তি সংস্থা বোস্টনে একটি সমাবেশ করেছিল। সারা বিশ্ব থেকে ১৭৫ জন এই সংক্রান্ত সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের যোগদানের মধ্যে ইতালি থেকেও ২ জন ছিলেন। এক সপ্তাহে কাটার আগেই এদের মধ্যে ৭০ জন করোনা ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হন। ম্যাসাচুসেটসে এক ধাক্কায় এত বড়ো সংক্রমণ কখনও দেখা যায়নি। আমার পুত্র প্রসিদ্ধ ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রধান কার্যালয়ের থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে থেকে পড়াশোনা করে। ম্যাসাচুসটসে সম্পূর্ণ জরুরি অবস্থা জারি হওয়ায় ও সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ায় সে এখন গৃহবন্দি।

অতীতের মহামারীগুলি থেকে কিন্তু শিক্ষাগ্রহণ জরুরি। ১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লু'র আক্রমণের সময় মার্কিন দেশের সেন্ট লুইস রাজ্যে মৃত্যুর হার ফিলাডেলফিয়ার থেকে অর্ধেক ছিল। এর কারণ দ্বিতীয় রাজ্যটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমর্থনে বড়ো বড়ো সভা করা হয়েছিল। কিন্তু সেন্ট লুইস সব ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। সেখানকার সমস্ত চার্চসমেত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ ছিল। এই প্রথমেই নেওয়া কড়া পদক্ষেপ হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সহায়ক হয়।

এ প্রসঙ্গে বলি, আমার দ্বিতীয় পুত্রটি আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। তার সংখ্যাতত্ত্ব বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা সহপাঠীরা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে। তাদের মতে সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, হংকং, থাইল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশগুলো চীনের সঙ্গে লেনদেনে যথেষ্ট জড়িত ও নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও করোনার সংক্রমণ সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে নি (www.it.ly/2TG9fsi)। এর অন্যতম কারণ এই দেশগুলি ২০০৩ সালে SARS মহামারির আক্রমণ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চায় করেছিল। কত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে ভাইরাল ইনফেকসনের ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো যায় সেটা খুঁজতেই তারা সোশ্যাল ডিসটেন্সিং বা সামাজিক দূরত্বের তত্ত্ব খুঁজে পায়।

ইতালি, ইরান, ফ্রান্স, জার্মানি বা স্পেন সংক্রমণ আটকাবার ব্যবস্থা নিতে অযথা দেরি করায় তাদের দেশে আক্রান্তের সংখ্যা পূর্ব এশিয়াকে ছাপিয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে ভারত বিদেশি আগমনের ক্ষেত্রে শুরুতেই প্রতিবন্ধকতা জারি করায় তা অন্য দেশগুলির মনঃপুত না হলেও কিছুটা ফলদায়ী হয়েছে।

হ্যাঁ, মৃত্যুর হার তিন শতাংশকে অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে করছেন। কিন্তু ভারত এক অতি বিশাল দেশ, এখানে করোনার মতো ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ এই প্রথম মেকাবিলা করতে হচ্ছে। একজন করোনায় সংক্রামিত আরও তিন জনকে সংক্রামিত করতে পারেন যাঁরা আরও ১৪ দিন সংক্রমণের সম্ভাবনা নিয়ে দিন কাটাবেন। যে সমস্ত মানুষের শরীরে উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস রয়েছে বা যাদের বয়স ৭০-এর আশেপাশে বা ঊর্ধ্বে তাঁরা এ রোগের সহজে শিকার হতে পারেন। দেশের অধিকাংশ হাসপাতালেই জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কারণে এই ধরনের শয্যাগুলি ভর্তিই রয়েছে। আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই মহামারীর কবলে পড়ে গেছি। একটা জিনিসই আমরা করতে পারি তাহলো সংক্রমণ ছড়াতে না দেওয়া যাতে আমাদের হাসপাতালগুলিতে নিতান্ত মরণাপন্নকে বাঁচানোর কিছুটা অন্তত স্থান থাকে।

আবার বলছি, এটা ভাবা ভুল যে ভারতের আসন্ন উষ্ণ আবহাওয়া আমাদের পরিত্রাণ করবে কিংবা আমাদের ভাইরাল রোগের ক্ষেত্রে এক ধরনের অন্তর্নিহিত প্রতিষেধক আছে। উলটে যদি আমরা অন্য দেশগুলির মতোই হই, দেখা গেছে প্রত্যেক দেশেই একটি দু'টি সংখ্যা দিয়ে শুরু হয়ে আক্রান্তের বন্যা বয়ে গেছে। ভারতের জনবসতির যে ঘনত্ব

সেখানে গোষ্ঠী সংক্রমণ ছড়ালে বিশাল বোমা ফাটার প্রতিক্রিয়া হবে। বহু বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ জার্মান রাজনীতিকঅ্যাঞ্জেলা মারকেল বলেছেন আমাদের মধ্যে২০ থেকে ৬০ শতাংশ আক্রান্ত হবে।

আমাদের কাছে একটিই মাত্র বাঁচার ছোট্ট জানালা খোলা আছে তা হলো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা যাতে সংক্রমণের সংখ্যা কমানো যায়। অবশ্যই আমরা হয়তো চীনের মতো সম্পূর্ণ লকডাউন বা দেশ বন্ধ করে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা নিতে পারব না কিন্তু কয়েকটি সাধারণ সাবধানতা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে।

(১) সমস্ত রকমের যাত্রা সে দেশের মধ্যে হোক বা বিদেশ, ট্রেন হোক বা বাস একেবারেই নিষিদ্ধ করতে হবে। দীর্ঘ পথ কোনো না কোনো যানবাহনে ভ্রমণ এই রোগ সংক্রমণের প্রধান সহায়ক।

(২) একটা ছোটো জায়গার মধ্যে বেশি সংখ্যক লোকের যেখানে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তা এড়িয়ে চলা। এর মানে স্কুল, ব্যায়ামাগার, মল, খোলা বাজার, পানশালা, থিয়েটার, সিনেমা, মন্দির, অন্যান্য প্রার্থনা স্থল, সাঁতার-পুকুর সবই পড়বে।

(৩) বাড়িতে থেকে কাজ করতে হবে। উপায় নেই অফিস বা কারখানায় একত্রে কাজ করলে অন্যের দ্বারা সংক্রামিত হওয়ায় সম্ভাবনা তো থেকেই যায়।

(৪) নিতান্তই যদি কর্মস্থলে পৌঁছতে হয় তাহলে অন্তত ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। ক্যান্টিনে যাওয়ার দরকার নেই। বাইরের যাদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা ছিল সেগুলি বাতিল করতে হবে। দশ জনের বেশি এক সঙ্গে থাকার দরকার নেই।

(৫) পূর্ব নির্ধারিত যে কোনো ধরনের সম্মেলন, খেলাধুলোর কর্মসূচি, মেলা, মিছিল, পথসভা, ক্রিকেট ম্যাচ দেখা বাদ দিতে হবে। এগুলি মহামারী ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনাময়।

এই সূত্রে আমি কর্ণাটক সরকারকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো, তারা সকলের আগে এই পদ্ধতিগুলি সাহস করে নিয়েছে। একই সঙ্গে দেশের অন্য রাজ্যগুলিকেও কর্ণাটককে অনুসরণ করতে বলব। একটি রাজ্য সরকারকে যদি ধরে নিতে হয় মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ আক্রান্ত হতে পারে, সেখানে ব্যঙ্গালুরুর মতো শহরেই ৫০০০ ক্রিটিক্যাল কেস-এর শয্যা থাকা জরুরি হয়ে পড়বে যার সঙ্গে অক্সিজেনের ব্যবস্থা থাকা তো অপরিহার্য।

করোনা ভাইরাসের রোগীরা সংক্রমণবাহক, তাই তাদের অন্যান্য রোগীর সঙ্গে সাধারণ হাসাপাতালে চিকিৎসা করানো চলবে না। প্রত্যেক রাজ্য সরকারেরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত কোনো নির্দিষ্ট হাসপাতালকে এই রোগের জন্য চিহ্নিত করা এবং অব্যবহার্য হয়ে পড়ে থাকা পুরনো কোনো হাসপাতালকে সংস্কার করে করোনা রোগীর জন্য অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ চালু করা। যেটি হবে কেবল করোনা হাসপাতাল।

এ কথাটাও মাথায় রাখা জরুরি যেহেতু করোনা ভাইরাসের রোগীরা সংক্রমণবাহক, তাই তাদের অন্যান্য রোগীর সঙ্গে সাধারণ হাসাপাতালে চিকিৎসা করানো চলবে না। প্রত্যেক রাজ্য সরকারেরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত কোনো নির্দিষ্ট হাসপাতালকে এই রোগের জন্য চিহ্নিত করা এবং অব্যবহার্য হয়ে পড়ে থাকা পুরনো কোনো হাসপাতালকে সংস্কার করে করোনা রোগীর জন্য অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ চালু করা। যেটি হবে কেবল করোনা হাসপাতাল। কর্ণাটকে বহু বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়ক যন্ত্রপাতি নিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। এগুলি করোনা স্পেশালিটি হাসপাতাল বলে লোকে জানছে।

দু' সপ্তাহের স্বল্প সময়ের মধ্যে ইতালিতে দু'শো থেকে দশ হাজার করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এর প্রধান কারণ প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত রোগীরা রোগের উপসর্গ কিছু ধরতেই পারেননি। নির্দ্বিধায় তারা রোগের বীজাণু নিজের থেকে অপরের শরীরে ছড়িয়ে ফেলেছেন। করোনার পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য লক্ষণ ধরা পড়লেই আলাদা করে রাখা। সেই কারণে সরকার অনুমোদিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠিত প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষাকেন্দ্র গুলিতে এখনই বিনামূল্যে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা চালু করা দরকার। দক্ষিণ কোরিয়া ও ইতালিতে ঠিক একই সময়ে এই মহামারী শুরু হয়। দক্ষিণ কোরিয়া বস্তুত সমস্ত নাগরিককেই পরীক্ষাধীন করেছিল এবং যাদের শরীরে রোগ লক্ষণ ধরা পড়েছিল তাদের সংস্পর্শে আসা প্রায় সমস্ত মানুষজনের পেছনে ধাওয়া করে তাদের সকলকে আটকে ফেলে। এর নাটকীয় ফল মিলেছিল। হায়! ইতালি এসবের ধার দিয়েও যায়নি, পরিণতি হয়েছে বিধ্বংসী।

আর একটি বিষয়, বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য প্রতিরক্ষামূলক সাজসরঞ্জামের খুবই অভাব দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ দেশ এই সমস্ত সামগ্রীর রপ্তানি ইতিমধ্যেই বন্ধ করেছে। ভারতীয় এন-৯৫ মুখোশ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে উপযুক্ত ভরতুকি দিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উৎপাদন শুরু হয়েছে। চিকিৎসা কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

এই সূত্রে যে ৫০ হাজার বিদেশে পাশ করা ডাক্তার ভারতে এসে লাইসেন্সের জন্য অপেক্ষা করছে তাদের অস্থায়ীভাবে অনুমোদন দিয়ে প্রবীণ ডাক্তারবাবুদের অধীনে কাজ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরা সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলির কেবলমাত্র ক্রিটিক্যাল কেস ইউনিট এই কাজ করবে। এটা করতে পারলে তারা জাতির এই ব্যধি-বিপর্যয় মোকাবিলায় এক মহামূল্য সম্পদ হয়ে উঠবে।

সরকারি নিয়মাবলী আত্মরক্ষার তাগিদেই মেনে চলতে হবে

ডাঃ শুভঙ্কর গৌড়া

নোভেল করোনাকে হু মহামারী ঘোষণা করেছে। করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের মুখোমুখি হয়েছে বিশ্ব। ভারতও করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামলাতে বেসামাল। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও ভয়ানক। রোজই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিশেষ করে কলকাতা, হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগণার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ভারত এখন 'ফেজ-২', 'ফেজ-৩' যখন তখন শুরু হতে পারে এই আশঙ্কায় এখন ভারতের ১৩০ কোটি জনসাধারণ। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা প্রায় ৯ কোটি। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে এমনিতেই করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা অপ্রতুল। মুখে জনগণকে আস্বস্থ করলেও বাস্তবে সেটা কতদিন লাগবে কেউ জানে না। রাজ্যে মৃত্যু মিছিল আটকানো যাচ্ছে না। খাতায়কলমে রাজ্য সরকার যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার তুলনায় অতি সামান্য।

যদিও এই করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর হার শতকরা ২ থেকে ৩ শতাংশ তবুও সেই সংখ্যাটি কম হবে না। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারতের গড় মৃত্যুর হারের থেকে বেশি। এটাই সবচেয়ে চিন্তাজনক।

তাই শুধু সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর সম্পূর্ণ রূপে ভরসা না রেখে নিজেদেরকেই আরও বেশি সচেতন থাকতে হবে। সরকারি সতর্কতার নিয়মাবলীগুলিকে যথাযথ ভাবে মেনে চলতে হবে নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদেই।

তাহলেই হয়তো অনেকটাই এই ভাইরাসের প্রকোপ থেকে নিজেদের আড়াল করা সম্ভবপর হবে। করোনা ভাইরাসের দুটি ভ্যাকসিন ইতিমধ্যেই ভারতে প্রয়োগ করা শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে রাশিয়ার তৈরি ভ্যাকসিনও ভারতে ব্যবহার করা শুরু হবে।

যাদের প্রথম দফার কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে তাদের নতুন নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ভ্যাকসিন ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ পরে নিতেহবে। কোভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফার কোনো সময়ের হেরফের হয়নি। দ্বিতীয় ভ্যাকসিনের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যথাসময়ে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে।

সরকারের তরফ থেকে আরও একটা সুখবর দেওয়া হয়েছে, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষকে দুটি ডোজ ভ্যাকসিন দিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

মাস্ক পরা কতটা জরুরি

মাস্ক পরা অবশ্যই জরুরি। মাস্কটা ঠিকঠাক নাকের ওপরে অবশ্যই পরতে হবে। করোনা থেকে বাঁচতে মাস্ক-ই সবথেকে বড় অস্ত্র।

- বারবার মাস্কের ওপর হাত দেবেন না। ব্যবহার করা মাস্ক যত্রতত্র ফেলে দেবেন না। একে অন্যের ব্যবহার করা মাস্ক ব্যবহার করবেন না।

- মাস্ক পরার উদ্দেশ্য হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ থেকে বেরিয়ে আসা জলকণা আটকানো। এছাড়া যাদের ক্রনিক হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস জাতীয় অসুখ রয়েছে তাদেরও মাস্ক পরা দরকার। খুবই জনবহুল এলাকায় গেলে প্রয়োজনে ডবল মাস্ক ব্যবহার করুন, হাতে গ্লাবস পরতে পারলে খুব ভালো হয়।

- ঘনঘন সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার অভ্যাস করুন। (অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে)। হাত ধোওয়ার উপায় না থাকলে অবশ্যই স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন।

(তথ্যসূত্র : ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন)

করোনা যুদ্ধের নির্ভীক সৈনিকরা আবার স্বমহিমায় আসরে অবতীর্ণ

সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দেশ রক্ষা করে সৈনিকরা, তেমনই এই করোনা যুদ্ধেও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ বাহিনী, এককথায় ফ্রন্টলাইনার যোদ্ধারা সর্বস্ব পণ করে দেশের মানুষকে রক্ষা করার সংগ্রামে আগেও অবতীর্ণ হয়েছেন এবং করোনার এই দ্বিতীয় ঢেউয়েও নিরলসভাবে সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। । ভারতে করোনা সংক্রমণের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এদেশের চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের অক্লান্ত সেবা সমগ্র দেশের মানুষের শ্রদ্ধা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। চিকিৎসক , স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশের এই নিরলস সেবাকার্যকে স্বীকৃতি দিতে আকাশ থেকে হেলিকপ্টারে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়েছে। তারও পূর্বে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই অক্লান্ত সেবাকার্যকে অভিনন্দন জানাতে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টধ্বনি অথবা করতালির মাধ্যমে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাফাইকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে। নতুন এই বিশ্বযুদ্ধে করোনার প্রথম সারির যোদ্ধারা, বিশেষ করে চিকিৎসক সমাজই যেন রণাঙ্গণে প্রকৃত বীর সৈনিকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। সংসার, আত্মীয়পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে এই যুদ্ধে সমগ্র মানব সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে আবারও যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চিকিৎসক সমাজ। করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে একদিন মানব সমাজ নিশ্চিত ভাবেই জয়ী হবে। সেই বিজয়ের জয়পতাকায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকবে চিকিৎসক সমাজের এই অবদানের কথা।

ইতিমধ্যেই বহু চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী করোনা আক্রান্ত রোগীর সেবা করিতে গিয়া সংক্রমিত হয়েছেন এবং সংক্রমণের দরুন অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। তবু এক মুহূর্তের জন্যও চিকিৎসকরা তাঁদের সেবার ব্রত থেতে বিরত হননি।

এত করার পরও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের আচরণ অত্যন্ত অমানবিক এবং নিন্দাজনক। বহু এলাকায় চিকিৎসক, পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এক শ্রেণীর মানুষের হেনস্থার শিকার হয়েছেন। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসক ও স্বাস্থকর্মীরা নিজের জীবন তুচ্ছ করে আমাদের রক্ষা করছেন। করোনার প্রথম প্রকোপের পর দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে। আবার হয়তো আসবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ঢেউ। কিন্তু সব ঢেউয়ের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন করোনা যুদ্ধের এই নির্ভীক সৈনিকরা। আমরাও তাঁদের পাশে রয়েছি— এই বার্তা দেওয়া এখন অতীব জরুরি।

করোনা সংক্রমণ মানেই মৃত্যু নয়

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মানেই কি মৃত্যু? এখনও পর্যন্ত যা তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে বলা যেতে পারে গুজবে কান দেবেন না। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মানেই মৃত্যু নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, করোনা ভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যুর হার ৪ শতাংশেরও কম। সুস্থতার হার ৯০ শতাংশের কাছাকাছি। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। অসুস্থ হয়ে পড়লে কী করবেন আর কী করবেন না যদি জানা থাকে তাহলে করোনা ভাইরাস আপনার কিছুই করতে পারবে না।

সর্দি, কাশি, জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট হলে—

১। কী করবেন :

অবিলম্বে কোনও চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। অথবা নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।

২। কী করবেন না :

অসুস্থতার কথা পরিবারের কারোও কাছে গোপন করবেন না। তাতে আপনি তো বিপদে পড়বেনই, আপনার সঙ্গে পরিবারের সদস্যরাও সংক্রামিত হবেন। আপনাকে সুস্থ করে তুললেই যেখানে ভাইরাসকে প্রতিহত করা যেত সেখানে আপনারই ভুলে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে করোনা ভাইরাস। সংক্রামিত হবেন বহু মানুষ।

করোনা মহামারীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবাকাজ

দেশের বিপদের দিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের দেশ ও জাতির সেবায় অগ্রণী ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। করোনা মহামারীর ভয়াবহ আবহে সারা দেশের স্বয়ংসেবকরা সরকারি স্বাস্থ্যবিধি পালন করে যথারীতি বিভিন্ন রকম সেবাকাজ করে চলেছেন। সিকিম, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের

১৩ হাজার ৮৯৮ জন স্বয়ংসেবক ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ৪ হাজার ৪৫৫ স্থানে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৯৪ পরিবারের হাতে চাল, ডাল, আলু ও শুকনো খাবার পৌঁছে দিয়েছেন। ৪৯ হাজার ৩২৫ জনতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করেছেন।

এর সঙ্গে জনসচেতনতা মূলক অভিযান, রক্তদান, প্রতিটি জেলায় সহায়তা কেন্দ্র, চিকিৎসকের টিম গঠন, সাফাইকর্মী, পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হয়। বস্তি এলাকায় স্বয়ংসেবকরা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেন। অন্যান্য রাজ্যে আটকে পড়া মানুষদের সেই সেই রাজ্যের পক্ষ থেকে সহায়তা দানের ব্যবস্থা করা হয়।

সবরীমালা মন্দিরে নারীর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ কেন

নরেন্দ্রনাথ মাহাতো

''সর্বং খল্বিদংব্রহ্ম''—সবকিছুই ব্রহ্ম, এই বোধ থেকে ভারতের ধর্মের উৎপত্তি এবং এই বোধ থেকেই প্রতীক দর্শন বা প্রতীকী পূজা এদেশে সুপ্রাচীন যুগ থেকেই প্রচলিত। শিব, দুর্গা, কালী থেকে শুরু করে লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী, কার্তিক, বজরঙ্গবলী, বৃক্ষ, গো, ভুমি ও প্রস্তর ইত্যাদি সকল পূজাই প্রতীকী পূজা। জ্যোতিষশাস্ত্রের নবগ্রহ পূজাও প্রতীকী পূজার অন্তর্গত। তাই আমরা বলি ধনের দেবী লক্ষ্মী, বিদ্যার দেবী সরস্বতী, বুদ্ধির দেবতা গণেশ, বলের দেবতা বজরঙ্গবলী, দুঃখের দেবতা শনি ইত্যাদি।

তেমনি ব্রহ্মচর্য বা ব্রহ্মচারীর দেবতা কেরলের সবরীমালা মন্দিরে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মচারী আয়াপ্পা ভগবান। ব্রহ্মচারী হলেন বাণপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী। ব্রহ্মচারী কঠোর সাধনার প্রতীক। কঠোরভাবে আত্মনিরীক্ষণ করে মনের বিকার জয় করে ভক্তির পথে মোড় নেয় ব্রহ্মচারীর জীবন। ব্রহ্মচারীর জীবন মানে পবিত্রতার সাধনা। তাই পবিত্রতার সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সর্বপ্রকার উপসর্গ থেকে দূরে থাকতে হয় ব্রহ্মচারীকে। ব্রহ্মচর্যের সাধনাকালে নারীর সংস্পর্শে পুরুষের পতন এবং পুরুষের সংস্পর্শে নারীর পতন হয়, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সত্যকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ভগবান আয়াপ্পা ব্রহ্মচারীর মন্দিরের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন—

''আমি তো সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি মানি।
দরশন দূরে থাক, প্রকৃতির নাম যদি শুনি।
তবে হি বিকার পায় মোর তনুমন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?''
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অর্থাৎ—আমি তো সন্ন্যাসী, সর্বপ্রকার কামচাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়-লালসার অনেক ঊর্ধ্বে, তবু আমি প্রকৃতির অর্থাৎ স্ত্রীলোকের দর্শন ত দূরের কথা নাম শুনলেও বিরক্ত হই। আমার তনুমনই যখন প্রকৃতি-দর্শনে বিকারগ্রস্ত হয়, তখন অন্য কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতি-দর্শনে মনস্থির রাখতে পারে? ভগবান শ্রীচৈতন্য জগতের জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের মধ্যে একজন পরম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি যে নিজের জিতেন্দ্রিয়ত্ব সম্বন্ধে এমন শিথিল অভিমত প্রকাশ করলেন, তা শুধু জনসাধারণের শিক্ষার কারণে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য। জনসাধারণের শিক্ষার জন্যই তিনি পরম-জিতেন্দ্রিয় ছোট-হরিদাসকে নামমাত্র অপরাধে চিরতরে

বর্জন করেন আর ছোট-হরিদাস কাঁদতে কাঁদতে জীবন দেন।

''প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।।''
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অর্থাৎ—বিষয়-বিরাগী হয়ে যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলে, তার মুখদর্শনও আমি করতে পারি না। দুর্বার ইন্দ্রিয় সর্বদাই বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি ভোগ্য বস্তু) গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। রক্তমাংসে গড়া সজীব নারীর কথা দূরেই থাকুক, এমনকি কাষ্ঠনির্মিত নির্জীব স্ত্রীমূর্তিতে পর্যন্ত সাধারণ লোকের কথা আর কি বলব, তপঃ-স্বাধ্যায়-সম্পন্ন বীর্যবান মুনিদেরও মনে চাঞ্চল্য আনতে পারে। অর্থাৎ নারী-সম্পর্কে ব্রহ্মচারীদের সহজেই চিত্তবিকার জন্মে, যোগভ্রষ্টতা ঘটে। এই তত্ত্ব এবং সত্যকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ''ব্রহ্মচারী আয়াপ্পা ভগবান'' নামক প্রতীক পূজার প্রচলন।

প্রশ্ন উঠেছে, ভগবান আয়াপ্পা ব্রহ্মচারী হতেই পারেন কিন্তু ঋতুমতী বয়সের মহিলাভক্তরা ভক্তি নিবেদন করতে গেলেই ভগবানের ব্রহ্মচর্য নষ্ট হবে, এটা কেমন কথা? উত্তরে বলি, ভগবান আয়াপ্পার ব্রহ্মচর্য রক্ষার জন্য ঋতুমতী মহিলাভক্তদের তাঁর মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এ কথা ঠিক নয়। ভগবান আয়াপ্পা ব্রহ্মচারীর মন্দিরে ঋতুমতী মহিলার অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ কথাটার রূপকীয় অর্থ হল, ব্রহ্মচারী যদি ভগবানও হন তবু তাঁর সান্নিধ্যে ঋতুমতী নারীর আসা উচিত নয়। এ কথা মানুষ ব্রহ্মচারীদের এবং ঋতুমতী নারীদের শিক্ষার জন্যই বলা হয়েছে। ভগবানের ব্রহ্মচর্য নষ্ট হবে ঋতুমতী নারীর সান্নিধ্যে একথা বলা হয়নি।

সংবাদে প্রকাশ, ভারতে প্রায় বিশ লক্ষ মন্দির আছে। সেই সকল মন্দিরে সব বয়সের নারীর প্রবেশাধিকার অব্যাহত। নারীর প্রবেশে যদি ভগবনের ব্রহ্মচর্য নষ্ট হত, তাহলে ওই বিশলক্ষ মন্দিরেও নারীর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হত। সুতরাং ঋতুমতী নারী মন্দিরে প্রবেশ করলে ভগবান ব্রহ্মচর্যভ্রষ্ট হন, এধারণা ভ্রান্ত। আর ভগবান আয়াপ্পা ব্রহ্মচারীর মন্দিরে ঋতুমতী নারীর অনুপ্রবেশ নিয়ে লিঙ্গ সাম্য ও অসাম্যের প্রশ্নও অবান্তর। কারণ, কোনও ধর্মীয় বিধানের ব্যাপারে আদালতের হস্তক্ষেপ সংবিধানসম্মত নয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে। বলাবাহুল্য সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের একমাত্র মহিলা সদস্য বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা এ কথাই বলেছিলেন বলে সংবাদে প্রকাশ। তিনি বলেন, বিশেষ কোনও ধর্মীয় আচরণ বা নিষেধাজ্ঞা বৈষম্যমূলক মনে হলেও আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

স্মরণে রাখা দরকার, প্রতীক পূজার মাধ্যমেই সনাতন সত্য বা শাশ্বত সত্য অর্থাৎ বেদ শিক্ষা দেওয়া হয় সাধারণ মানুষকে। পুরাণের দেবতার পূজা বলতে এই প্রতীক পূজাকেই বোঝানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন--- ''উপনিষদেরই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রূপকগুলি আজকাল স্থূলভাবে পরিণত হইয়া আমাদের গৃহে পূজার বস্তু হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমাদের ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকগুলি সবই বেদান্ত হইতে আসিয়াছে, কারণ বেদান্তে ওইগুলি রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমশঃ ওই ভাবগুলি জাতির মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে প্রতীকরূপে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।...পুরাণ পঞ্চলক্ষনান্বিত। উহাতে ইতিহাস, সৃষ্টি তত্ত্ব, নানাবিধ রূপকের দ্বারা দার্শনিক তত্ত্ব সকলের বিবৃতি প্রভৃতি বহু বিষয় আছে। বৈদিক ধর্ম সর্বসাধারণে প্রচার করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়। বেদ যে ভাষায় লিখিত তাহা অতি প্রাচীন; অতি অল্পসংখ্যক পণ্ডিতই ওই গ্রন্থের সময় নিরূপণে সমর্থ। পুরাণ সমসাময়িক লোকের ভাষায় লিখিত— উহাকে আধুনিক সংস্কৃত বলা যায়। ওইগুলি পণ্ডিতদের জন্য নয়, সাধারণ লোকের জন্য; কারণ সাধারণ লোক দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। তাহাদিগকে ওই সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্থূলভাবে সাধু, রাজা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এবং ওই জাতির মধ্যে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেইগুলির মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। মুনিরা যে-কোন বিষয় পাইয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু প্রত্যেকটিই ধর্মের নিত্য সত্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।'' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫/১২-১৩)।

ভারতের পরম সৌভাগ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখাতে পারে যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি ভারতেই বিকশিত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি হল বেদমান্য এবং ব্যাসমান্য সংস্কৃতি। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজ সমস্যার সমাধান ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিচার ধারা থেকেই পেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্বকে বুঝতে না পেরে আজকের ভারতবাসী নিজ সমস্যার সমাধানের জন্য সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ায়। তাই বলা হয় ভারতীয় জাতি বর্তমানে আত্মবিস্মৃত জাতি।

ধর্মীয় প্রতীক হল আমাদের সাংস্কৃতিক সূত্র। সূত্র হল অল্পাক্ষর, অসংদিগ্ধ, সারগর্ভ ও ব্যাপক অর্থ প্রকাশক। প্রতীক ঠিক তাই। যেভাবে ছোট ছোট সূত্রের মধ্যে অনন্ত অর্থ সমাহিত থাকে, যেভাবে একটি ছোট বীজের মধ্যে বিশাল বৃক্ষের স্বরূপ লুক্কায়িত থাকে, সেই ভাবেই প্রতিটি প্রতীকের পশ্চাতে একটা উদাত্ত ভাবের সুগন্ধ লুকিয়ে থাকে। যেমন, ভৌতিক দৃষ্টিতে বিচার করলে ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকা কাপড়ের ছোট্ট একটি টুকরা মাত্র, যার মূল্য বিশেষ কিছুই নেই। কিন্তু সাংস্কৃতিক ভাবের দৃষ্টিতে বিচার করলে তা অমূল্য। রাষ্ট্রের কোটি কোটি জনগণের প্রাণের বিনিময়েও তার সম্মান রক্ষা করা উচিত। অর্থাৎ প্রতীক হল বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। প্রতীক ভাবকে অভিব্যক্ত করার কলা। প্রতীক সংকেতে শাস্ত্রের রহস্য উন্মোচনকারী অতুলনীয় বিজ্ঞান। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

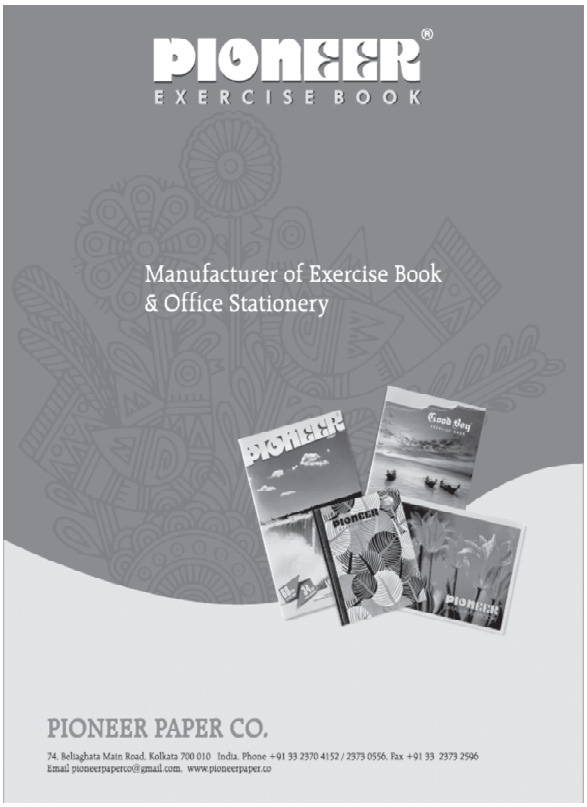

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

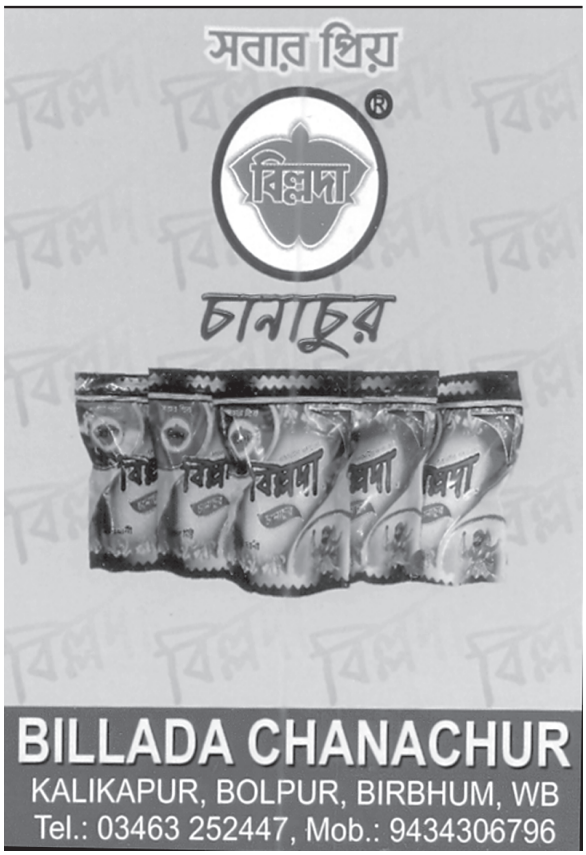

সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের অবস্থান

মণীন্দ্রনাথ সাহা

মানব সমাজে সবচেয়ে বেদনাদায়ক জীবন যাপন করেন বোধহয় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ অর্থাৎ হিজড়েরা। নারী-পুরুষের আকৃতি পেলেও তারা কোনোদিন মাতৃত্বের বা পিতৃত্বের স্বাদ পান না। আর সমাজও বোধহয় সে কারণে এদের সুনজরে দেখে না। তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে জন্ম নেওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবুও এরা মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা পুরণের স্বাদ পাবার জন্য অন্যের সংসারে আসা নবজাতককে ক্ষণিকের তরে আদর করে শান্তি পেতে চান এবং পরিবারের কাছ থেকে কিছু পুরস্কার পাবার আশা করেন।

হিজড়েরা বহুকাল থেকেই দেশে বিরাজমান। সেই মহাভারতের যুগেও যেমন ছিল, মুঘল আমলেও ছিল, এখনও তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মহাভারতের বিরাটপর্বে বিরাটরাজ গৃহে উর্ব্বশী নামে এক বিদ্যাধরীর অভিশাপে অর্জুনের ক্লীবত্ব প্রাপ্তির কথা জানা যায়। ইতিহাসে দেখা যায় মুঘল আমলে হিজড়েরা ভালো ছিল। সেখানে রাজদরবারে এমনকী জেনানা মহলে অর্থাৎ রানির ব্যক্তিগত মহলে হিজড়েরা স্থান পেতেন। রানির খাস কামরার দ্বাররক্ষী হিসেবেও তাঁদের দেখা গেছে। এমনকী কেউ কেউ তো রাজদরবারে উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করতেন। তবে যুগ এবং সময়ের সঙ্গে সর্বত্রই বদলেছে পরিস্থিতি। এখনও অনেক মানুষের অন্ধ বিশ্বাস আছে যে হিজড়ের নবদম্পতি ও বাচ্চাকে আশীর্বাদ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের বয়স যত বাড়ে ততই তাঁদের উপার্জনও কমতে থাকে। তাদের নানারকম কার্যকলাপ, যৌনতা বা নাচ এসব থেকে অল্প বয়সে যে অর্থ তাঁরা রোজগার করেন, বয়েস বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই তা আর করা সম্ভব নয়। তাই যত বয়স হতে থাকে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে যায়। আর মাথা গোঁজার সংস্থান না থাকায় একটা সময়ে বেওয়ারিশ লাশ হয়ে হারিয়ে যায় এই পৃথিবীর বুক থেকে। তাই এদের বসবাসের জন্য অনেক জায়গায় সরকার বাসস্থান তৈরি করে দিয়েছে। এদের প্রতি কেউ যেন অন্যায় আচরণ করতে না পারে তার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া আছে।

সাধারণত দুজন মহিলা হিজড়া একসঙ্গে রোজগারের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। তখন এদের সঙ্গে থাকে একটা ছোট্ট ঢোল। যা ওরা নিজেরাই বাজাতে পারে। নবজাতকের বাড়িতে বা বিয়ে বাড়িতে গেলে এদের মধ্যে একজন ঢোল বাজায় আর অপরজন নেচে-গেয়ে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দান করেন। এছাড়াও তারা গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, বাসে, ট্রেনে ঘুরে ঘুরে রোজগার করে। তবে বিয়ে বাড়িতে এবং নবজাতকের বাড়িতে গেলে এদের চাহিদা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে। যেমন কোনো বাড়িতে যদি পুত্র সন্তান হয় তো কোনো কথাই নেই। পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনুমান করে পাঁচ, দশ বা পনের হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করে বসে। তখন গৃহকর্তাকে বাধ্য হয়ে দরাদরি করতে হয়। এদের মনোমতো অর্থ দিতে আপত্তি করলে অনেক সময় অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে এবং কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে। যা দেখে পরিবারের সকলে লজ্জিত হয়ে ওদের দাবি মেনে নেন।

কোনো মেয়ের বিয়ে বাড়িতে গিয়ে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে টাকা, কাপড় নেয় এবং আহার করে। আবার সেখানেই পাত্র পক্ষের কাছ থেকে কন্যাপক্ষের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ আদায় করে। দিন দিন ওদের দাবি যেন অত্যাচারের সামিল বলে মনে করেন অনেকেই। যেখানে লেনদেনে ওদের মন ভরে না সেখানে ওরা ধাক্কা-ধাক্কিও করে আর ভয় দেখায় থানায় যাও না, সেখানে গেলেও আমাদের কিচ্ছু হবে না। সরকার অমাদের পক্ষে। বুঝুন ঠ্যালা। শুভকাজে গৃহকর্তা আনন্দ সহকারে ওদের যা বকশিষ দেবেন তা যদি ওরা খুশিমনে গ্রহণ করে তাহলে কোনো গোলমাল হওয়ার কারণ থাকে না। কিন্তু ওদের অতিরিক্ত চাহিদাই গোলমালের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে সরকারও দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না।

সমাজে বৈষম্য আছে, থাকবে, কিন্তু তার সঙ্গে একটু একটু করে যদি মানুষের মানসিকতা বদলায়, একটু ভিন্ন চোখে হিজড়েদের দেখা হয়, তাহলে মানবিকতর যে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে তা বলাই বাহুল্য। তবে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন করা যায় কিনা সে বিষয়ে সরকারের ভেবে দেখা উচিত। যদি অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে এদের ফিরিয়ে আনা যায় তার মতো ভালো কাজ আর কিছু হয় না। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। □

করোনা আতঙ্কে ফিরছে সনাতন রীতি

সারা বিশ্বে যেভাবে করোনা ছড়াচ্ছে সেখানে বেঁচে থাকাই খুব দুষ্কর। চীন-ভারত আফ্রিকা ইতালি, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ আরব, ওমান, কাতার সব দেশের মানুষই মৃত্যুর আশঙ্কায় দিন গুনছে। সবাই ভাবছে কী পদ্ধতি অবলম্বন করলে ছোঁয়াছুঁয়ি এবং রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত থাকা যায়। হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রোগী রেখেও ডাক্তার, নার্সদের স্বস্তি নেই। এক সময় ছিল ওলাওঠা রোগ। শব দাহ করতে গিয়ে ফেরার পথে দু'একজনের শুরু হতো ভেদ বমি। রোগীকে রাস্তায় রেখেই বাকিরা ছুটে পালাতো। গ্রামকে গ্রাম শেষ হয়ে যেত। বাকি লোক ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতো। তারপরে পুরো গ্রামটাই হয়ে যেত ভূতের গ্রাম। তখন অবশ্য ডাক্তারের ও ওষুধপালার তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। বিজ্ঞান ছিল না এত উন্নত। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা সত্ত্বেও মানুষের বেঘোরে প্রাণ যাচ্ছে। ডেংগু, করোনা মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে।

মানুষ সমাজ ও ধর্মকে কাছে টানতে পারছে না। বাঁচার তাগিদে দু' গজ ব্যবধান রেখেই সব করার চেষ্টা করছে। ফিরছে প্রাচীন সনাতন পদ্ধতি। দূর থেকে দু'হাত জোড় করে করছে নমস্কার। ভেস্তে যাচ্ছে করমর্দন প্রথা। বন্ধ হচ্ছে কবর দেওয়ার পদ্ধতি। সবাই পুরাতন পদ্ধতিকে বেছে নিচ্ছে জীবাণু ধ্বংস করার স্বার্থে। এই পদ্ধতিতে যেমন জায়গার সমস্যা হয় না, তেমনি জীবাণু থেকে বাঁচার একটি মোক্ষম পদ্ধতিও বটে। তাই সনাতন পদ্ধতি গ্রহণ করাকে আমি যুক্তিযুক্তই মনে করি।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

বাঙ্গলায় বিজেপির উত্থান

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে ৩ জন এমএলএ থেকে ৭৭ জন এমএলএ নির্বাচিত হওয়া বাঙ্গালির মনে নতুন করে আলোর উন্মোচন হয়েছে। হিন্দু বাঙ্গালিরা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারতীয় জনসঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন ১৯৫১ সালে। ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ২ জন এমপি ও বাঙ্গলা থেকে নির্বাচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে জনসঙ্ঘ ভারতীয় জনতা পার্টিতে পরিণত হয়েছে ১৯৮০ সালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বিজেপি কোনোদিন এত ভালো ফল করতে পারেনি। ১৮ জন এমপি ৭৭ জন এমএলএ এবং প্রধান বিরোধী দল। বাঙ্গলা পার্টির ইতিহাসে বিরল নজির স্থাপন করেছে।

আগামী দিনে বিজেপি বাঙ্গলায় সরকার গঠন করবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন সফল হবে। নিন্দুকেরা বিজেপি হেরেছে বলে চিৎকার করছে। বিজেপি কি বাঙ্গলায় সরকারে ছিল? না ছিল না। তাহলে কীভাবে বিজেপি হারলো উত্তর দিতে হবে সমালোচকদের। বিজেপির কার্যকর্তাগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ফল পেয়েছে। আগামী দিনে আরও নিরলস পরিশ্রম করে পার্টিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। এই দায়িত্ব সকল কার্যকর্তাদের নিতে হবে।

—আলি হোসেন,
রাজ্য সভাপতি, সংখ্যালঘু মোর্চা।

লকডাউনে মানসিক অবসাদ

সম্প্রতি সারা দেশ জুড়ে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে আংশিক লকডাউন জারি হয়েছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ। দরকার না থাকলে বাইরে বেরোতে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু অবিরাম গৃহবন্দি দশা আর কতক্ষণই বা ভালো লাগে? তাই বাড়ছে অবসাদ, একাকিত্ব। এর একটা বড়ো কারণ হলো নেতিবাচক খবর। নেতিবাচক খবর থেকে দূরে থাকাই এখন ভালো। নয়তো মানসিক চাপ বাড়ে। নিজের প্রিয়জনদের হারানোর একটা ভয় সবার মধ্যে কাজ করছে। সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনও মাধ্যমে নেতিবাচক খবর বেশি ছড়ায়। সেইজন্য মানুষের মধ্যে উদ্বেগও বাড়ছে।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য ঘুমের খুব প্রয়োজন। ঠিক সময় ঘুমোতে যেতে হবে এবং ঘুম থেকে উঠতে হবে। একটা কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, দিনের বেলা ঘুমলে চলবে না। এখন আংশিক লকডাউনের জন্য অনেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছেন। সেজন্য অনেকেই বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকে। এই অভ্যাস না পালটালে পরিণামে মানসিক অবসাদের শিকার হতে হবে।

এছাড়া ল্যাপটপের ব্যবহারও কমাতে হবে। কেননা ল্যাপটপের নীল রশ্মি দেহ ও মন, দুইয়েরই ক্ষতি করে। আরও একটা দিকে নজর দিলে ভালো হয়। শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে ধ্যান ও যোগব্যায়াম এবং সেই সঙ্গে ডিপ ব্রিদিংয়ের অভ্যাস করতে হবে। ডিপ ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ে। এতে উদ্বেগ অনেকটাই কমবে। কিছু নতুন অভ্যাস শুরু করা যেতে পারে। যেমন বাগান করা ইত্যাদি।

—সব্যসাচী শীল,
কলকাতা-৯১।

CHOOSE THE BEST

DURO™

LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION

TRIPLE HEAT TREATED

DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY

MADE FROM MATURE AND SUSTAINABLE RAW MATERIAL

LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE

The Forest Friendly Company

Duroply Industries Limited

BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS

113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata 700016 | **P:** (033) 2265 2274 | **Toll Free:** 1800 345 3876 (DURO)

Email: corp@duroply.com | **Website:** www.duroply.in | **Find us on** duroplyindia

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
24 May - 2021 - Rs. 12.00
Postal Registration No. KOL RMS/048/2019-2021

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশুনার জন্য
আশ্রম বিদ্যালয়

বিবেকানন্দ মিশন

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম
যোগাযোগ : মো- ৯৪৩৪২৫০০৪৭ / ৯১৫৩২৬০১৬০

- দু'বছরের সম্পূর্ণ আবাসিক জীবন আপনার ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ বদলে দেবে।
- ২০২১ সালে বিজ্ঞান বিভাগে ৫০ জন ও কলাবিভাগে ৫০ জন ভর্তি নেওয়া হবে।
- একমাত্র এখানেই সম্পূর্ণ গুরুকুল পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানো হয়।
- প্রথম থেকেই অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়।
- সম্পূর্ণ ভারতীয় সনাতন পরম্পরায় ছাত্রছাত্রীরা বড় হয়ে ওঠে।
- এই দু'বছরের যত্ন ও গুরুত্ব গড়ে দেয় সারা জীবনের ভিত।
- ২০২১ সালে যারা মাধ্যমিক দেবে তারা ভর্তির জন্য এখনই ফোন করুন।

SWASTIKA DIGITAL | SWASTIKA DIGITAL | swastikadigitalindia@gmail.com
Contact us | Chandrachur Goswami :9674585214 | Anamika Dey : 9903963088

Published and Printed by Sarada Prasad Paul on behalf of OmSwastik Prakashan Private Limited at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6. Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Rantidev Sengupta. ।। দাম ১২ টাকা ।।